কেট মিলেট-এর লৈঙ্গিক রাজনীতি : শিক্ষিত এবং কর্মজীবী নারীরা যেভাবে পিতৃতান্ত্রিক হয়ে ওঠে

নাহিদা নিশি

প্রাকপিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর গুরুত্ব বেশি থাকলেও সমাজ পিতৃতন্ত্রের দিকে বাঁক নেয়ার সাথে সাথে নারী পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে নারীকে কেবল সন্তান জন্মদানের যন্ত্র কিংবা বীর্য রাখার পাত্র হিসেবে গণ্য করা হতো। নারী ছিল পুরুষের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিন্ন একটি জগতের বাসিন্দা।

১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট তাঁর A Vindication Of The Rights Of Women বইটিতে নারীর পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে শিক্ষাকে দায়ী করেন। নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, “পুরুষকে নারীর চেয়ে সপ্রতিভ দেখায় কারণ নারী পুরুষের সমান শিক্ষার সুযোগ পায় না।” একটা সময় পর্যন্ত ধারণা করা হতো, সমান শিক্ষার সুযোগ পেলেই নারী বেরিয়ে আসবে পিতৃতন্ত্রের শাসন ও শোষণ থেকে। বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াও নারীশিক্ষা সম্পর্কে একই মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন, “কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক”। নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে দাবিগুলো তুলে ধরেছিল, তার অন্যতম ছিল– পুরুষের সমান শিক্ষার সুযোগ।

বর্তমান বিশ্বে নারীশিক্ষার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্টাটিসটিকস ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীশিক্ষার হার ৭১.২%। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটছে, যা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু নারীর প্রকৃত মুক্তি ঘটছে কি?

না, নারীবাদী আন্দোলনের প্রকৃত যে লক্ষ্য– নারীর মানসিক বিকাশ ঘটানো, পিতৃতন্ত্রের পাতা ফাঁদ থেকে নারীকে বের করে আনা, নারীর আত্মমর্যাদাবোধ এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা– এর কোনোটারই বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব হয় নি এখনো। নারী শিক্ষিত, স্বাবলম্বী, কর্মজীবী হয়েও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে পারছে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে নারীই নারীর সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়, আবির্ভূত হয় পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিরূপে। অশিক্ষিত, অচেতন, পিছিয়ে পড়া নারীদের মতো তারাও ধর্ষণের

কারণ হিসেবে নারীর পোশাক এবং চলাফেরাকে দায়ী করে। নারী সহকর্মীর পদোন্নতিতে আরেক নারীই মুখ বাঁকিয়ে নোংরা ইঙ্গিত করে। ম্যারিটাল রেপ-এর মতো গুরুতর অন্যায়টিকে বিভিন্নভাবে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। স্বামীর হাতে দুইবেলা মার খেয়েও চুপচাপ সংসার করে। এমনকি নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলে যাওয়া নারীটিকেও চরিত্রহীন, নষ্ট, পতিতা আখ্যা দিয়ে বসে। এই যে উচ্চশিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা নারীবাদী না হয়ে উলটো পিতৃতন্ত্রের জননী ও রক্ষাকর্তা হয়ে উঠছে, এর পেছনে কারণ কী? নারী কি তবে সত্যিই নারীর শত্রু? নাকি নারীর পেছনে নারীকে শত্রু হিসেবে লাগিয়ে রাখাটাই পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র?

কেট মিলেট তাঁর Sexual politics গ্রন্থে বলেন, পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

শিক্ষিত নারীরা কীভাবে পিতৃতন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, এর পেছনের ষড়যন্ত্রগুলো কী কী, তা মিলেট-এর Sexual politics (লৈঙ্গিক রাজনীতি)-র আলোকে এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

মতাদর্শগত

মতাদর্শ হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সমষ্টি, যা একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তির বাইরে গিয়ে ধারণ করে। মানুষকে কোনো একটি মতাদর্শে দীক্ষিত করতে পারলে বাকি কাজগুলো হাসিল করে নেয়া সহজ হয়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্র আমাদের মধ্যে 'পুরুষই শ্রেষ্ঠ' এমন একটি অসত্য অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে বদ্ধমূল করে তোলে। পরিকল্পিত বিশেষ ছকে নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বকে বেঁধে দেয়। জন্মের পর থেকে আমরা রোজ শুনতে থাকি, পুরুষেরা হয় আক্রমণাত্মক, বলবান, বুদ্ধিমান আর নারী হয় মূর্খ, বশমনা, অপদার্থ। পিতৃতন্ত্র স্থির করে দেয় নারীর হাঁটা-চলা, ওঠা-বসা, হাসি-কান্না সবকিছু। নির্ধারণ করে দেয়, নারী দেখবে ঘর-সংসার, পুরুষ করবে উপার্জন। যার ফলে শিক্ষিত, কর্মজীবী হওয়া সত্ত্বেও, পুরুষের সমান অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও, সংসারের সমস্ত কাজ নারীকেই করতে হয়। সমাজে পুরুষ প্রভুর ভূমিকা পালন করে বলে নারী হয়ে থাকে দাসী।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং অনেক সময় নারী নিজেও বিশ্বাস করে যে, নারী-পুরুষের এই আচরণ ও অবস্থানগত পার্থক্যের মূল কারণ হলো তাদের শারীরিক পার্থক্য। সেক্স এবং জেন্ডার যে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, বেশিরভাগ শিক্ষিত নারী-পুরুষই এই সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। তারা বিশ্বাস করে, নারী শারীরিকভাবে দুর্বল বলেই নারীর সামাজিক অবস্থান পুরুষের নিচে।

কিন্তু যদি মেনেও নিই যে, পুরুষ শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তারপরেও কি পুরুষ নারীকে শোষণ করার, নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার রাখে? না, রাখে না। শারীরিক শক্তি বা পেশি যদি রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি হতো, তাহলে কালোরা শাসন করত সাদাদের; শ্রমিকেরা রাজত্ব করত বিশ্বব্যাপী। নারী কোনো ক্ষেত্রেই জৈবিক কারণে পিছিয়ে থাকে নি। এর পেছনে বরাবরই পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি, পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী ছিল।

এরিস্টটল তাঁর Politics গ্রন্থে বলেন, "নারী হলো অপূর্ণাঙ্গ পুরুষ, সঙ্গমকালীন দুর্বলতার কারণেই কন্যাসন্তান অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ পুরুষের সৃষ্টি হয়"! প্লেটো মনে করতেন, অকর্মণ্য, অলস, অপদার্থ পুরুষেরাই শাস্তিস্বরূপ পরের জন্মে নারী হয়ে জন্মায়। পিতৃতন্ত্রের মোড়লেরা এভাবেই যুগে যুগে সমাজে পুরুষাধিপত্য, পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। নারীরাও এই অধস্তনতাকে চুপচাপ স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ নারী-পুরুষের কেউই আচরণগত গুণ নিয়ে জন্মায় না। সমাজ-সংস্কৃতির কারণে তাদের ভেতর পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে নারী হয়ে ওঠে পিতৃতন্ত্রের গোলাম। তারা পুরুষের নির্বোধ শিশ্নটির পূজা করতে থাকে রাত-দিন।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা

আমাদের সমাজে যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত, সেহেতু প্রত্যেকটি নারী সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবারের প্রধান পুরুষটি, বাবা কিংবা ভাই। নারীর স্বাধীনতায় প্রথম বাধাটি আসে পরিবার থেকেই। পরিবারই প্রথম শেখায়, জন্মগতভাবে নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পুরুষের আছে। আমরা আমাদের মাকে সবসময় দুর্বল, ছোট, অধস্তন অবস্থানে দেখি। মায়েদের কোনো মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না আমাদের পরিবারে। এসব দেখে দেখে নারীর এই অধস্তনতাকেই নিয়ম বলে ভেবে নিতে শিখি আমরা। অন্যদিকে বাবাকে দেখি কর্তা বা প্রভুরূপে, যে কোনো বিষয়ে তাঁর কথাই শেষ কথা। পরিবারের নারী সদস্যরাও একইভাবে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করতে শেখে। পিতৃতন্ত্রের সমস্ত শর্ত মেনে চলার শিক্ষা আমরা মায়ের কাছ থেকেই পাই। নির্যাতিত হই পরিবারের সদস্যদের দ্বারা। পরিবারই প্রথম নারীকে চুপ থাকার, মার খাওয়ার, মেনে নেয়ার, মানিয়ে নেয়ার শিক্ষা দেয়।

পরিবার সমর্থন করে না বলে লক্ষ লক্ষ নারী উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেও চাকরিবাকরি না করে ঘরসংসার করে জীবন কাটাচ্ছে। পিতৃতন্ত্র কৌশলে নারীর মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যে, নারীর সমস্ত দায়িত্ব যখন পুরুষ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তখন নারীর ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, নারী নিজেও অন্যের টাকা-পয়সা, অন্যের বাড়ি-গাড়িকে নিজের ভেবে গর্বিত হয়। খুশি মনে দাস্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পুরুষ কিন্তু নারীকে বসিয়ে খাওয়ায় না মোটেও। বরং বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে আসে বিনে পয়সার ফুলটাইম কাজের লোক ও যৌনদাসী হিসেবে! উচ্চশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত যাই হোক না কেন, নারীর কোনো মতামতের দাম দেয় না পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলো। স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারে না অনেকে। এমনকি এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কাটতে গেলেও তারা স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করে। পরিবারের মাধ্যমেই পিতৃতন্ত্র নারীকে বাধ্য করে তার সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে। ধর্মের নামে, অধিকারের নামে পরিবার হয়ে ওঠে নারীর ওপর ঘটতে থাকা সমস্ত অন্যায়ের আশ্রয়দাতা। অবলম্বন বলে বিশেষ কিছু থাকে না বলে টিকে থাকার স্বার্থে নারীকেও পরিবারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। পরিবারের মাধ্যমেই পিতৃতন্ত্র তার ব্রহ্মাস্ত্রটি নারীর দিকে ছুড়ে দেয়।

শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমেই নারীজাতির শ্রেণি, অবস্থান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেখানে মানুষের মর্যাদাগত অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সেখানে কিছু নারী তাদের মেধা এবং শ্রমের দ্বারা পুরুষের তুলনায় উচ্চমর্যাদার আসনে পৌঁছে যায়। পুরুষকে পেছনে ফেলে শিক্ষায়, সম্মানে ও আর্থিক দিক থেকে তারা এগিয়ে থাকে। কিন্তু তখনো নারীকে লিঙ্গের বিচারে পিছিয়ে থাকতে হয়। মিলেট বলেন, “লিঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ বুর্জোয়া, নারী প্রলেতারিয়েত”। নারী শিক্ষায়, কর্মে, যোগ্যতায় পুরুষকে ছাড়িয়ে গেলেও পৌরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে রিকশাচালকদেরও দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে। অশিক্ষিত অযোগ্য যে কোনো পুরুষ ধর্ষণ করতে চায় শিক্ষিত-কর্মজীবী নারীদের। তারা পৌরুষের জোরে নারীর সমস্ত যোগ্যতাকে ছোট করে দেখে। বিশ্বাস করে যে, সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের চেয়ে হীন।

পিতৃতন্ত্র নারীর ভেতরেও শ্রেণিবিভাগ ঢুকিয়ে দেয়। এক নারীকে আরেক নারীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখে। নারীকে সতী, অসতী, পতিতা, গৃহলক্ষ্মী, বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পিতৃতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। নারীমুক্তির যে আন্দোলন, তার বিরুদ্ধে নারীকেই দাঁড় করিয়ে দেয়। পুরুষ সবসময়ই নারী জাগরণকে ভয় পেয়েছে নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে। কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সর্বদা নারীবাদকে নারীর কাছে খারাপভাবে উপস্থাপন করেছে। নারীর অধিকার নিয়ে কথা বললেই চরিত্রহীন, পতিতা বলে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। পিতৃতন্ত্র কৌশলে শাশুড়িকে লাগিয়ে রেখেছে বউয়ের পেছনে, গৃহিণী নারীকে লাগিয়ে রেখেছে কর্মজীবী নারীর পেছনে। এরা একদল ঈর্ষা করে আরেক দলের স্বাধীনতাকে। পুরুষ এই দুই দলকেই ব্যস্ত রাখে চিরশত্রুতায়। এমনকি নারীবাদী নারীরাও শ্রেণিযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়, একে অপরের

মতামতকে খারিজ করে দিতে চায়। নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে গিয়ে নোংরা গালাগালির বন্যায় ভাসে।

মিলেট মনে করতেন, নারীজাতির শ্রেণি উন্নতি ঘটানো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। খুব কম নারীই আছেন, যারা শুধু নিজের যোগ্যতায় উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

উচ্চশ্রেণির পুরুষের সম্পত্তিকে স্ত্রীরা নিজেদের সম্পত্তি ভেবে ভুল করে বসে। তাদের পরিচয় বড়জোর ধনী কোনো পুরুষের স্ত্রী কিংবা মা! তারা পরগাছার মতো অন্যকে আঁকড়ে বেঁচে থাকে। পিতৃতন্ত্রের সাথে সুর মিলিয়ে তারা নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে জীবন কাটায় এবং এটাকেই তাদের চয়েজ বলে তৃপ্তি পায়।

অর্থনৈতিক

একটা সময় নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান বলতে কিছু ছিল না। নারী নিজের অধিকারে কোনো সম্পত্তি অর্জন করতে পারত না। বর্তমানে এ বিধি কিছুটা শিথিল হলেও নারীর অর্থনৈতিক ভিত্তি এখনো শক্ত হয় নি। নারী চিরকাল খেটেছে, পুরুষের চেয়ে বেশিই খেটেছে, কিন্তু বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক পায় নি। নারীর অধস্তনতার অন্যতম বড় কারণ হলো আর্থিক পরনির্ভরশীলতা। কখনো পিতা, কখনো স্বামী কখনো সন্তানের ওপর নির্ভর করে থেকেছে তাদের অর্থনীতি। যেসব নারী বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়, তাদেরও পুরুষের তুলনায় সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পুরুষেরা নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি মেনে নিতে চায় না। কারণ তারাও বিশ্বাস করে যে, স্বাবলম্বী নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। সে কারণেই পিতৃতন্ত্র ঘর সামলানো, সন্তান লালনপালন, স্বামীর সেবাযত্ন করাকেই নারীর জন্য মহান কাজ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংসারধর্ম, দয়া-মায়া-মমতা, সহ্যশক্তি– এগুলোকে দিয়ে নারীর মহত্বের পরিমাপ করেছে। সংসার করা, সন্তানের জন্য নিজের পেশাজীবন ত্যাগ করা, এগুলো যদি এতই মহৎ কাজ হয়, তাহলে পুরুষ কেন চাকরি-বাকরি ছেড়ে সংসার করতে রাজি হয় না? তাদের কি এতটুকুও মহান হবার ইচ্ছা জাগে না কখনো? পিতৃতান্ত্রিক সমাজ শুধু নারীকে ঘরবন্দি করার উদ্দেশ্যে, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার লক্ষ্যে এইসব শ্রুতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে নোংরাভাবে।

নারী যেখানেই কাজ করুক, তার কাছে সকলে অল্প খরচে অধিক সেবা প্রত্যাশা করে। আমাদের মায়েরা একটা গোটা জীবন রান্নাঘরে কাটিয়ে দেয় শুধু খাওয়া-পরার বিনিময়ে। চাকরিজীবী বউ সংসারে সময় দিতে না পারলে শাশুড়ি-ননদই সবার আগে কথা শোনায়। বেতনের সমস্ত টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় অনেকে। সংসার, সন্তান-সন্ততির চাপে বেশিরভাগ নারীই তাদের পেশাজীবন বিসর্জন দিয়ে পতিসেবায় নিযুক্ত হয়।

২০১৯ সালে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'এশিয়া প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড স্যোশাল আউটলুক' শীর্ষক গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীর বেকারত্বের হার পুরুষের চারগুণ। দেখা গেছে, এই তালিকায় উচ্চশিক্ষিত নারীর সংখ্যাই বেশি।

পিতৃতন্ত্র নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কুটিলতার চোখে দেখতে শেখায়। কর্মজীবী নারীর চরিত্র সম্পর্কে ঘৃণা ছড়ায়, যেন নিন্দার ভয়ে নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরি-বাকরি করতে নিরুৎসাহিত হয়! পাশাপাশি, এর ফলে গৃহিণী নারীদের মধ্যে কর্মজীবী নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। তারা বিনা পয়সায় সংসারে গাধার খাটুনি খাটার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের অবলম্বন বলে একটা কানাকড়িও থাকে না তাদের। তাই বাধ্য হয়ে নির্যাতকের সাথেই সংসার করতে হয়।

শিক্ষা

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও নারীর অবস্থানগত উন্নতি ঘটে না। কারণ আমরা যা শিখি, যতটুকু শিখি তার কর্তৃত্ব থাকে পিতৃতন্ত্রের মোড়লদের হাতে। ধর্ম, নীতি, মূল্যবোধ, দর্শন, শিল্পকলা, সবই পুরুষের তৈরি। পুরুষই আমাদের পাঠ্যপুস্তক এবং জানার পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয়। পিতৃতন্ত্র নারীকে সেই শিক্ষাই দিতে উৎসুক, যা শেষপর্যন্ত পুরুষের কল্যাণে লাগে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে স্কুল-কলেজে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই কিন্তু নারীর জ্ঞানের পরিধিকে করে রেখেছে সীমাবদ্ধ। পুরুষ আজীবন নারীকে শোষণ করতে চায়, না পারলে বড়জোর বশে রাখতে চায়, কিন্তু বিরোধিতা সহ্য করে না একেবারে। পুরুষেরা যাতে নারীশিক্ষার প্রতি একটু আধটু আগ্রহী হয়, তার লক্ষ্যে একসময় মেরি ওলস্টোনক্রাফট কিংবা বেগম রোকেয়ার মতো নারীবাদীরা কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, সুগৃহিণী হওয়ার স্বার্থেই নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। কিন্তু ট্রাজেডি হলো, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি দেখে মনে হয়, সুগৃহিণী হওয়া ছাড়া নারীর শিক্ষা গ্রহণের আসলেই কোনো উদ্দেশ্য নেই। বেশিরভাগ মেয়েই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায় ভালো, উচ্চবিত্ত একটি স্বামীর আশায়।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে অনলাইন মেডিকেল জার্নাল প্লজ ওয়ানে প্রকাশিত গবেষণায় এমবিবিএস শেষ বর্ষের মোট ৩১৪ জন ছাত্রীর ওপর এক জরিপ করা হয়। জরিপে অংশ নেয়া ছাত্রীদের ১৭ শতাংশ বলেছিলেন, বিয়ের বাজারে এই পেশার দাম আছে।

সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার শিক্ষার চেয়ে নারীকে 'পুরুষের বিরোধিতা না করার' শিক্ষা দিতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। একইসঙ্গে আমরা নিতেও চাই এ ধরনের শিক্ষা। 'পর্দা মানেই অবরোধ না' কিংবা 'সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তেই সুশিক্ষা প্রয়োজন'– এসবেই আটকে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা।

স্কুল-কলেজগুলোতে কোনোরকম যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা নেই। পাঠ্যপুস্তকও পিতৃতন্ত্রের শিক্ষা দিয়ে ভরা, যেখানে মেয়েকেই শুধু মায়ের সাথে ঘরের কাজ করতে দেখা যায়! গার্হস্থ্য শিক্ষায় এখনো কেবল মেয়েদেরই পড়ানো হয়, অথচ ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, সন্তান পালনের শিক্ষা পুরুষের জন্যেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মেয়েরা নিজেরাও পুরুষের দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে পুরুষকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে তারা সংসারধর্ম পালনে মনোনিবেশ করছে। সাজগোজ করে সারাদিন পুরুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে। তারা বুকের ওড়না আর মাথার হিজাব সামলাতে সামলাতেই জীবনের অর্ধেক সময় নষ্ট করে ফেলছে।

পিতৃতন্ত্রের শিক্ষা নারীর মানসিক বিকাশে সাহায্য তো করেই না, উলটো বাধা প্রদান করে এবং নারীকে বসায় পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধির আসনে।

বলপ্রয়োগ/ধর্ষণ

পিতৃতন্ত্র বরাবরই পুরুষকে নারীর ওপর শারীরিক, মানসিক বলপ্রয়োগের অধিকার দিয়ে এসেছে। বিভিন্নভাবে ধর্ষণ, নিপীড়নের বৈধতা দিয়েছে। নারী সবসময়ই পুরুষের ভয়ে ভীত থেকেছে, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত অন্যায় অনুশাসন। একই অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর আঙুল তোলে আর পুরুষেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষ মানেই তার পীড়নের অধিকার আছে। শিক্ষিত সচেতন পুরুষেরা শারীরিক পীড়ন না করলেও মানসিক অত্যাচারে নারীর জীবন অতিষ্ট করে তোলে। নির্যাতনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নারীরাও।

ধর্ষণ আমাদের সমাজের নিয়মিত ঘটনা, যা নারীর ওপর বলপ্রয়োগের একটি হিংস্ররূপ। জীবদ্দশায় শারীরিক নির্যাতন কিংবা উৎপীড়নের শিকার হয় নি, এরকম নারী এ দেশে হয়ত একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন কিংবা রাস্তাঘাটের অপরিচিত পুরুষদের দ্বারা নারীরা রোজ লাঞ্ছিত হয়। বিচার হয় না একটিরও।

আইন ও সালিস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৯৭৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ৪৮ জনকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়।

নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেয়েও বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো। অথচ ইনিয়ে বিনিয়ে এই সমাজ এখনো ধর্ষিতাকেই দায়ী করে, জোর করে ধর্ষকের সাথেই বিয়ে দিয়ে দেয়। বিচারের বদলে টাকা-পয়সার মাধ্যমে চাপা দিয়ে ফেলে বড় বড় অন্যায়গুলো, যার ফলে ধর্ষণের হার দিন দিন বাড়তেই থাকে।

বৈবাহিক ধর্ষণের প্রতিবাদ করে না শিক্ষিত নারী-পুরুষও, বরং হাসাহাসি করে এই অপরাধটিকে বাড়তে দেয়। মনে করে, স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে সঙ্গমে জোর করার। এখানে ১৬-২৫ বছর বয়সী ৬০ ভাগ ছেলে মনে করে নারীকে পেটানো জায়েজ আছে। ১৫-২৪ বছর বয়সী ৬৩ শতাংশ পুরুষ বিশ্বাস করে, স্বামীর সাথে যৌনতায় সম্মতি না দিলে স্ত্রীকে জোর করা অনুচিত নয়। নারী নিজেও বউ পেটানোর পক্ষে, ম্যারিটাল রেপের পক্ষে, ধর্ষণের পক্ষে সাফাই গায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, লোকলজ্জার ভয়ে চুপ থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ধর্ষকের চেয়ে ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র বিশ্লেষণে বেশি আগ্রহী হয়। পুরুষ এভাবে শারীরিক পীড়ন, মানসিক নির্যাতনের দ্বারা নারীকে চিরকাল পুরুষের ভয়ে ভীত করে রেখেছে।

পিতৃতন্ত্র নারীর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ষণের শিকার হলে নারীরই সম্ভ্রমহানি ঘটে। নারীকে মিষ্টিদ্রব্য আর পুরুষকে মাছির সাথে তুলনা করে শিক্ষিত সমাজও পুরুষের এইসব অপরাধের বৈধতা দিয়ে দেয়।

ধর্ম

পিতৃতন্ত্র নারী সম্পর্কে যেসব বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করে, নারী তার কোনোটিরই স্রষ্টা নয়। পিতৃতন্ত্রের মূলকথা 'নারী নিকৃষ্ট'। নারীকে পুরুষ নিজের অধস্তন করে রাখার জন্য নারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার সৃষ্টি করেছে শুরু থেকেই। পরবর্তী সময়ে এগুলো ধর্মীয় রূপ পেয়ে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রভাবশালী। পিতৃতন্ত্র নারীকে দায়ী করেছে পুরুষের দুর্দশার জন্যেও, বিধাতা সৃষ্টি করে বিধাতাকেও করেছে পিতৃতান্ত্রিক। একইসঙ্গে নারীকে বলেছে ছলনাকারী, ডাইনি, অশুভ।

বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষই ধর্মভীরু, কাজেই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অমান্য করে নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত করা এখানে কঠিন হয়ে পড়েছে। নারীর পক্ষে পিতৃতন্ত্রের সবকটি বাধা পেরোনো সম্ভব হলেও শেষপর্যন্ত ধর্মকে কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, ধর্মের কারণে তারা পুরুষের প্রভুত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মনুসংহিতায় [১:৩] বলা হয়েছে, 'কুমারী কালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে নারীকে, নারী স্বাধীনতা অযোগ্য।'

হাদিসে পুরুষকে নারীর দ্বিতীয় বিধাতার সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কোরানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।' (সুরা বাকারাহ: ২২৩ আয়াত)

ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী নারীকে এটাও বিশ্বাস করতে হয় যে, নারী নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না কিংবা নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার, নারীকে শাসন করার অধিকার পুরুষের আছে। কাজেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ধর্মভীরু নারীরা পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করতে পারে না, কর্মজীবী হয়েও পুরুষের দাস্যবৃত্তি করে জীবন কাটায়। নারীর প্রকৃত স্বাধীনতাকে তারা পাপের চোখে দেখতে শেখে। অন্যদিকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ফতোয়াবাজদের দ্বারা নিগৃহীত হতে হয়। মৌলবাদীদের হাতে কোপ খাওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

কেউ কেউ বলে থাকে যে, ধর্মের সাথে নারীবাদের কোনো সংঘর্ষ নেই। কিন্তু মানতে না চাইলেও সত্যি এটাই যে, ধর্ম আর নারীবাদ একসাথে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। ধর্ম যেহেতু চিরন্তন সত্য, কাজেই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্মে কোনোরকম পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। ইসলাম ধর্মে নারীর পোশাক কেমন হবে, নারীর শরীরের ঠিক কতখানি অংশ পর্দার বাইরে থাকবে, স্বামীর সাথে নারীর আচরণ কেমন হবে, নারী কতটা শিক্ষিত হবে, নারীর কণ্ঠস্বর কতটা নিচু হবে সবই নির্ধারিত। দু'চারটা উদারতার বাণী দিয়ে এ দেশের শিক্ষিত নারীরা কিছুটা সুবিধা নিতে যায় ঠিকই, তবে প্রকৃত সত্য হলো, ধর্মে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনো অপশনই নেই। সে কারণেই এখানে মৌলবাদী পুরুষেরা প্রকাশ্যে নারীদের তেঁতুলের সাথে তুলনা করতে পারে, নারীশিক্ষার বিরোধিতা করার স্পর্ধা দেখাতে পারে।

না, আমি বলছি না যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে নারীবাদী হওয়া যাবে না! প্রত্যেকে তার নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী নারীবাদের চর্চা করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ধর্মের সমস্ত বিধি নিষেধই মেনে চলতে হয়, একটু এদিক সেদিক হলেই ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে, যার ভয়ে নারী অনেক সময় চাইলেও পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না।

পিতৃতন্ত্র নারীর বাইরের জগতের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ করে নারীর মনোজগতকেও। পিতৃতন্ত্র কেবলই নারীর সতীত্বের ওপর জোর দেয় এবং নারী নিজেও পিতৃতন্ত্রের সমস্ত শর্ত মেনে 'ভালো মেয়ে' হয়ে থাকার চেষ্টা করে। পুরুষকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। পুরুষও পদে পদে নারীকে তার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে, যার ফলে নারীর মানসিকতা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ে। তারা নিজেরাই নিজেদের শ্রেণিকে অবজ্ঞা করে, হীনম্মন্যতায় ভোগে, পুরুষের কাছে নিজেদের সস্তা ভোগ্যপণ্য করে তোলে। পিতৃতন্ত্র দয়া করে কোনো নারীকে সম্মান দিলে তারা গোটা দুনিয়ায় পিতৃতন্ত্রের মহত্বের প্রচারণা চালায়, যেন নারীর স্বাধীনতা, নারীর সম্মান, সবকিছুর মালিকানাই পুরুষের হাতে।

নারীর যে কোনো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে সমাজ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রতিনিয়িত নোংরা মন্তব্যের ছড়াছড়ি চলতে থাকে। সংবাদ মাধ্যমগুলোও পিতৃতন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে; একই অপরাধে অভিযুক্ত নারীকে পুরুষের চেয়ে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর মগজেও পিতৃতন্ত্রের জয়গান ঢুকিয়ে দেয়। বুঝতে শেখার পর থেকেই শুনে আসছি, 'যত শিক্ষিতই হও না কেন, যত বড় চাকুরিই করো না কেন, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ, সেই তো স্বামীকে রান্না করেই খাওয়াতে হবে।' কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে রান্না করে খাওয়ালে অন্য নারীরাই সেই পুরুষের পুরুষত্ব নিয়ে হাসাহাসি করে, হিজড়া বলে ছোট করার চেষ্টা করে। রান্নাঘরের সাথে নারীর যৌনাঙ্গের কোনো বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক আছে কি না জানা নেই আমার।

শিক্ষিত নারীদের একাংশ মনে করে যে, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করার জন্যই শুধু নারীশিক্ষার প্রয়োজন। কারণ মা শিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হবে। সংসার, স্বামী-সন্তান এসবের বাইরে গিয়ে তারা কখনো নিজেদের কথা ভাবতে পারে না। নারীর আদর্শ রূপের ছাঁচটি পুরুষের নির্মাণ করা, নারী সেই ছাঁচে পড়ে নিজের পিতৃতান্ত্রিক আচরণকেই 'নারীত্ব' ভেবে নেয় এবং সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

পিতৃতন্ত্রকে নারী কীভাবে লালন করছে, তার ওপর ভিত্তি করে এখানে আদর্শ নারী এবং নষ্ট নারীর সনদপত্র দেয়া হয়। পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করলেই সমাজ তাকে নষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল, পতিতা, নাস্তিক, ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। সামাজিক ও মানসিকভাবে হেনস্থা করে।

'নারীবাদ মানেই প্রকাশ্যে ধূমপান, ছোটখাটো পোশাক, নারী-পুরুষের ঢলাঢলি, অবাধ যৌনতা'– পিতৃতন্ত্র এই কথাগুলো সমাজে এত বাজেভাবে ছড়িয়েছে যে 'নারীবাদী' এখন একটা গালির মতো হয়ে গেছে। নারীরা নারীবাদ সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করছে। শুধু প্রকাশ্যে ধূমপান করেই কেউ নিজেকে নারীবাদী দাবি করেছে কি না জানি না, তবে কোনো নারীবাদীর প্রকাশ্যে ধূমপানে যদি পিতৃতন্ত্রের ইগো আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে প্রকাশ্যে ধূমপান করাটাও একটা বড় কাজ হয়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গালে এগুলো একেকটা থাপ্পড়। ছোটখাটো পোশাক পরেই যদি কেউ তার স্বাধীনতা প্রকাশ করতে চায়, করুক। 'হিজাব পরে নারীবাদ' যদি প্রশংসার যোগ্য হয়, তবে 'শর্টস পরে নারীবাদ'-এর সমালোচনা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অন্যের ক্ষতি না করে, পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করে নারী যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, কারণ নারীবাদের কোনো সীমারেখা নেই। অবশ্য এখনো বেশিরভাগ নারী বিশ্বাস করে যে, নারীর স্বাধীনতার লাগামটি শেষমেষ পুরুষের হাতেই থাকা উচিত।

‘নারীবাদ মানে পুরুষের প্রতিযোগী না, সহযোগী। নারীবাদ মানে পুরুষবিদ্বেষ না। নারীবাদ মানে ব্লাহব্লাহব্লাহ’– এইসব বলে বলে মুখের ফেনা তুলে ফেলে এক শ্রেণির নারী। এরা পিতৃতন্ত্রকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। এইসব শিক্ষিত নারীর ওপর ভর করেই পিতৃতন্ত্র টিকে থাকে। এরা সারাক্ষণ পুরুষের সাথে আপোশ করে চলার শিক্ষা দিতে থাকে। অথচ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এইসব কথায় গলে গিয়ে নারীবাদকে কখনো জায়গা ছেড়ে দেয় নি, দেবেও না।

পুরুষ একবারও ভাবে নি নারীর পাশাপাশি হাঁটার কথা। নারীকে সহযোগী তো দূরের কথা, প্রতিযোগী হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় নি কখনো। অথচ নারী যদি আজ পিতৃতন্ত্রকে তার শত্রু ভাবে, পুরুষকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে চায়, যদি বলে ‘পুরুষ অত্যাচারী, তার পাশাপাশি হাঁটার ইচ্ছা এবং রুচি কোনোটাই আমার নেই’– তাহলে তার নারীবাদ, নারীত্ব সব খারিজ করে দেয় এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ছুড়ে ফেলে দেয় ‘নারীবাদের নামে নষ্টামি’ করাদের দলে! পিতৃতন্ত্র কৌশলে নারীর অজ্ঞতা, নারীর অধস্তনতাকে যুগ যুগ ধরে যত্নসহকারে টিকিয়ে রেখেছে।

দিন বদলাচ্ছে, নারীবাদের পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। হাজারও সমালোচনা সহ্য করে কিছু নারী নারীবাদের আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, যতটা তাদের খুশি! নারীবাদের আকাশ অত্যন্ত সুন্দর। পিতৃতন্ত্রের নোংরা খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসুক রং-বেরং-এর নারী পাখি! পিতৃতন্ত্রের সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারা নারীবাদী হয়ে উঠুক!

নাহিদা নিশি শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। nahida.nishi19@gmail.com

তথ্যসূত্র

- Sexual Politics by Kate Millett (Urbana: University of Illinois Press, 2000)
- স্ত্রীজাতির অবনতি, বেগম রোকেয়া (১৩১৪)
- www.askbd.org
- https://thedailystar.net/country/news/63-men-agree-beating-their-wives-justified-if-denied-sex-study-1986329
- https://www.womennews24.com/স্বাক্ষরতার-হারে-এগিয়ে-যাচ্ছে-নারী/10747
- http://people.duke.edu/~wj25/UC_Web_Site/myth/science.html